Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VII, Issue-I, July 2018, Page No. 180-186
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

অন্ত্যজ সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ : জীবনের প্রথম তিরিশ বছর

বর্ষা বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপিকা, বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজ, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের সূর্যকে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) কেন্দ্র করে যেসকল নক্ষত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন রবীন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্দশ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর একান্নবর্তী পরিবারে। তাঁর জন্মক্ষণ ছিল প্রাচীন সংস্কারের আবর্জনা সরানো সংস্কারহীন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার এক মুক্ত বাতায়নে - "আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নূতনকাল সবে এসে নামলো, তার আসবাবপত্র তখনো এসে পৌঁছায়নি, আমি ধনের মধ্যে জন্মাইনি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না। এই নিরালায় এই পরিবারে যে স্বাতন্ত্র্য জেগে উঠেছিল জীবজন্তুরই স্বাতন্ত্র্যের মতো।"[১]

এই পরিবার ছিল সবদিক থেকে ভিন্ন ধরনের। নর-নারীদের মধ্যে কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ চালচলনের মধ্যে একটা আভিজাত্য ছিল। মধ্যযুগীয় বাতাবরণের মধ্যেও য়ুরোপীয় আধুনিকতা নানাভাবে প্রবেশ করেছিল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই জোড়াসাঁকোর বৈঠকখানা ও বেলগাছিয়া বাগানবাড়িটি বিলাতি ছবি ও নানারকম আসবাব সজ্জিত হয়ে উঠেছিল। অন্দরমহল সেজে উঠেছিল জাজিম ফরাস, মছলন্দ, তাকিয়া, আলবোলা ফরসিতে। এমনকি দেবেন্দ্র পরিবার (পুত্র ও জামাতাগণ) সাহেবিয়ানাকে রপ্ত করতে পেরেছিল। বাড়িতে বিলাতি অর্গান-বাঁশির প্রচলন দেখা যায়। সর্বোপরি আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের জন্য একটা বিশাল বিলাতি পাইপ-অর্গান কেনা হয়েছিল। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে শিশু রবীন্দ্রনাথ বেড়ে উঠতে থাকেন।

রবীন্দ্রজন্মের সমকালে বাঙালি অন্তর ও বাহিরে যে সমাজ সংসারে মুক্তির আহ্বান আসে তার মূলে ছিল য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যদিও দেবেন্দ্রনাথের মার্জিত রক্ষণশীল মতামতের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের মতামতের মিল অনেকক্ষেত্রে ছিল না তবু ঠাকুর পরিবারের অন্দরমহল ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছিল। এমনকি সাহিত্য ও সমাজের আলো-আঁধারের মধ্যে এক নতুন নক্ষত্রের (রবীন্দ্রনাথ) আবির্ভাব এই পরিবারের দিগন্ত প্রসারিত করে দিল। বংশগত ধারাবাহিকতা যেমন প্রতিভার একটি দিক তেমনি কালের প্রভাবের গুরুত্বও কিছু কম নয়। সিপাহী বিদ্রোহের অবসান, পার্লামেন্ট শাসনের আবির্ভাব - ভারতবর্ষ শাসন করতে আরম্ভ করলো সমগ্র ব্রিটিশ জাতি। ফলে দেশের অভ্যন্তরে সুশাসন ব্যবস্থার নাম করে ভারতবাসীকে আরও শক্ত করে বিচিত্র রকমের বিধি নিয়মের জালে বন্দী করার এক নতুন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। রাজস্ব আদায়, আয়ব্যয়ের নতুন ব্যবস্থাপনা, নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়; ভারত শাসন ব্যবস্থার নতুন আইন তৈরী হয়, এই সব নিত্যনতুন শাসন শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ কালের গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করে। রেলপথ চালু হলে বিদেশী বাণিজ্যের পথ আরও মসৃণ হয়ে ওঠে। শিক্ষাবিস্তার ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ফলে ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন আসে। ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে এই অধ্যায়টি এক নতুন যুগের সূচনা করে। এই পরিবর্তন কোন বিদ্রোহ

বা বিপ্লব নয়। নতুনের সাথে পুরাতনের যে ভিন্নতা, প্রাচীন শিক্ষা ও বিশ্বাসের সাথে নতুন জ্ঞান ও শিক্ষার যে প্রভেদ তা হলো গুণগত – পরিমাণগত নয়।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘনঘটার পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন বাঙালির হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায়- ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কালটি বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, বিদ্যাসাগরের স্ত্রী শিক্ষা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ক আন্দোলন, নীলকরদের অত্যাচার- সেই বিষয়ে হরিশ মুখার্জির হিন্দু-পেট্রিয়ট প্রতিবাদ, ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর আবির্ভাব, দেশীয় নাট্যশালার আবির্ভাব ও নাট্য সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে বাঙালি জাতির আত্মপ্রকাশ। এই সকল ঘটনাগুলি বাংলার সমাজকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল।

সারদাদেবী ও দেবেন্দ্রনাথের সংসার তাঁর রীতি অনুসারে আত্মীয়-অনাত্মীয় কুটুম্ব-কুটুম্বিনী আশ্রিত-আশ্রিতাতে ভরপুর থাকত। অবশ্য পিরালী ব্রাহ্মণ পরিবারে জাত যাবার ভয়ে অনেকে আবার এড়িয়ে চলত। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র-পুত্রবধূ, মেয়ে-জামাতা দৌহিত্র-দোহিত্রীদের উপস্থিতিতে ধনীঘরটি সর্বদা ভরপুর থাকত। এই বৃহৎ পরিবারে দাস-দাসী, বাবুর্চি, খানসামা, পাইক হরকরা নামেয়ব গোমস্তা, ওস্তাদ বাজিয়ে গাইয়ে এবং ভৃত্যদের অভাব ছিল না। আবার এই ঠাকুরবাড়িতে জামাইরা সকলেই ঠাকুর পরিবারে বাস করত, কারণ পিরালী ব্রাহ্মপরিবারে ব্রাহ্মণ সন্তানরা বিবাহ করে জাত খুইয়ে তারা আর তাদের পৈতৃক বাড়িতে স্থান পেত না, সেই জন্য তাদের জায়গা হত এই ঠাকুর বাড়িতে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের পরিবার যখন এমনভাবে বহু শাখাপ্রশাখাতে বিস্তারিত হয়ে পড়েছে – তখনই সেই 'অধিক আত্মীয়স্বজনের মাঝখানে' আবির্ভাব হল রবীন্দ্রনাথের।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য অন্ত্যজ মানুষদের যে উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তার সূত্রপাত ঘটে তাঁর শিশুকালে ভৃত্য বা চাকরদের অধীনে কাটানো জীবন থেকে। তাই অতি শৈশবে আপনজনদের স্পর্শলাভ থেকে বঞ্চিত, সেই অবহেলা সদ্য জন্মানো শিশু কি ভাবে দাসী ও ভৃত্যদের কাছে লালিতপালিত হয়েছে, সেই বেদনা সেই অবহেলার কথা কবি জীবনস্মৃতি বা ছেলেবেলাতে প্রকাশ করেন। কবি যখন বড় হলেন তখন একটু একটু করে বিশ্ব কবির পৃথিবীর আলো বাতাসের ঘ্রাণ নিতে নিতে অন্দরমহল থেকে বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করল চাকরদের মহলে বা ভৃত্য রাজকতন্ত্রে। চাকরদের তত্ত্বাবধানে তাঁর দিন কাটত। চাকররা তাদের সুবিধেমতো বা নিজেদের প্রয়োজনে শিশুর শৈশবকে বন্দী করে রাখত- তাদের চঞ্চলতা, উদ্দামতা, এমনকি খেলাধুলা ছুটোছুটি দুরন্তপনাকে নিরস্ত করত, কখনো প্রহারের মধ্যে দিয়ে কখনো বা ভয় দেখিয়ে। এইরকম একজন ভৃত্যের নাম মানিক দাস। যার হাতে সোমেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন- "কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে দুর্লভ ছিল, তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, তখন সামান্য যাহা কিছু পাইতাম, তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে আঁঠি পর্যন্ত কিছুই ফেলা যাইতো না।"[২] রবীন্দ্রনাথের ৬ বৎসর বয়সে যে চাকর তাঁকে ও সোমেন্দ্রনাথকে দেখাশুনা করত তার নাম ছিল নদের চাঁদ এবং সত্যপ্রসাদের দেখাশুনার দায়িত্ব যার উপর ছিল, তার নাম মাধব দাস। এই ভৃত্যরা মাসিক বেতন পেত।

রবীন্দ্রনাথের শৈশবের ভৃত্য মাধব দাস, গোবিন্দদাস ঈশ্বর দাস, শ্যাম – সকলে ছিল ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য। বেশভূষার অভাব যে রবীন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনে দেখা গিয়েছিল তার কারণ হিসেবে রবীন্দ্রগবেষক প্রশান্তকুমার পাল জানিয়েছেন- "ভৃত্যদের তস্করতার জন্যই কেনা পোশাকগুলি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করার সুযোগ পাননি- যেখানে ভৃত্য ঈশ্বর দাশ যে জলখাবারের পয়সা, লুচি ও দুধ চুরি করত, একথা তো রবীন্দ্রনাথই জানিয়েছেন।"[৩]

প্রিয়জনের স্নেহস্পর্শ যার কাছে ছিল দূরের বস্তু, তার কাছে বাস্তবের এই চাওয়া-পাওয়া যেন অতি তুচ্ছ মূল্যহীন, তাইতো চুরি হয়ে যাওয়া দুধ মিষ্টি কিংবা জামাকাপড় বা শীতের পোষাকও তার হৃদয়ে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যাঁর হৃদয় ছিল ভালোবাসার জন্য কাঙাল তার কাছে এই বস্তুর মূল্য কিভাবে দাম পেতে পারে?

তাইতো, কুড়ানি, কেষ্ট, রতন, মধু কৈবর্ত্য, ছিদাম, ছেলেটা কিংবা সহজ পাঠের অজস্র চরিত্র আমরা পাই। এই রকমই এক ঝাঁক চরিত্র ভিড় করে এসে দাঁড়িয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের সরণীতে।

ঠাকুর পরিবারে ছোটোদের লেখাপড়ার দেখাশুনার ভার ছিল সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথের উপর। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠসূচির মধ্যেই ছোটোদের বন্দী রাখতেন না, সেইজন্য তাদের বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরই সূত্র ধরে নানা বিদ্যার আয়োজন চলত ঠাকুর পরিবারে। জিমনাস্ট্রিক, ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা, ছবি আঁকা প্রভৃতি এবং প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য আলাদা আলাদা টাকা বরাদ্দ ছিল।

ব্রাহ্ম ধর্মের জমিদারের তনয় হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ উঁচু তলার মানুষের সংস্পর্শে বেশি পেয়েছিলেন। নীচু বা প্রান্তিক মানুষ তার ত্রিশ বৎসরের জীবনে ভৃত্য বা চাকর বাদে খুব একটা বেশি দেখা যায় না, কিন্তু নীচু জাতের মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা যে কত প্রকট ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়— কবির যখন নয় বৎসর বয়স। বাড়িতে আসত কুস্তি বিদ্যার শিক্ষক। কিন্তু সেই শিক্ষক ছিল জাতে মুচি। সাধারণ নিয়মে শিষ্য গুরুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরিবারের এই সন্তান কি করবে? গুরু হল জাতে মুচি আর ছাত্র হল ব্রাহ্ম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর কৃতিমান এই পুত্রটিকে শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই শিখিয়েছিলেন। শিশু রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই শিক্ষা তার পরবর্তী জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। বিষয়টি তাঁর নানা সাহিত্যপ্রকরণে নানারূপে প্রকাশ পায়। শিশু ও কিশোর রবির জীবনে সমাজে অবহেলিত মানুষগুলির ছবি তাঁর মানসপটে আঁকা ছিল। সদর স্ট্রিটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রত্যহ সূর্য ওঠা ও সূর্য অস্ত যাওয়া দেখতে দেখতে মুটে মজুর, কুলি, জলওয়ালা, এসকল দীন-দরিদ্র মানুষগুলি রবীন্দ্রসাহিত্যে থরে থরে সাজানো।

রবীন্দ্রনাথের ৩০ বৎসরের জীবৎকালে তাঁর সাহিত্যে অন্ত্যজ মানুষের কথা সেভাবে লিপিবদ্ধ না হলেও চিঠিপত্রে কিছু কিছু ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৮-৮৯ সালে শ্রীশবাবুকে ১১নং চিঠিতে তিনি লিখছেন— "কলকাতা থেকে সোহাগপুর যাত্রাপথে কবির ভাবনাতে দরিদ্র মানুষগুলির ছবি নানাবর্ণে বর্ণিত হয়েছে— প্রথমে বাড়ির জমাদার, তার পরে মোসাহেব - তার পরে একে একে দৃষ্টি পথে পড়ল। তারপরে সেকেণ্ড ক্লাসের সেকড়া গাড়ির ছাতের উপরে গুটানো বিছানা একটা কলরব, লোকের ভিড়, দারোয়ানদের সেলাম, চাকরদের প্রণাম, সরকারদের নমস্কার।"[৪]

কবি তাঁর ১৩নং চিঠিতে লিখেছেন। এক বাদলামুখর দিনে ম্যাজিস্ট্রেট কবি তাঁর ঘরে অতিথি হিসেবে আপ্যায়ন করেছেন। তার থাকার জন্য ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে চাকরদের প্রাত্যাহিক জীবনের ছবি কবি বর্ণনা করেছেন— "বাঁশের ঝোলার উপর তাকিয়া গদি ময়লা লেপ টাঙানো - চাকরদের গুলটিকে তামাক, তাদেরই দুটো কাঠের সিন্দুক, তাদেরই মলিন লেপ, ওয়াড়হীন তৈলাক্ত বালিশ ও মসীবর্ণ মাদুর। একটুকরো ছেঁড়া চট ও তার উপরে বিচিত্রজাতীয় মলিনতা।"[৫]

সাজাদপুরের অনতিদূর থেকে ১৯নং চিঠিতে জেলেদের জীবনের নানান ছবি চিত্রিত করেছেন— "এই খানিকটা সবুজ ঘাস, এই খানিকটা স্বচ্ছ জল দেখে পৃথিবীর শিশুকাল মনে পড়ে- অসীম জলরাশির মধ্যে যখন স্থল সরে একটুখানি মাথা তুলেছে - চারিদিকে জেলেদের বাঁশপোঁতা - জেলেদের জাল থেকে মাছ ছোঁ মেরে নেবার জন্য চিল উড়ছে, পাঁকের উপরে নিরীহ বক দাঁড়িয়ে আছে— নানানরকম জলচর পাখি - জলে শেওলা ভাসছে।"[৬]

জমিদারী দেখাশুনার কাজে পদ্মার বুকে ভাসতে ভাসতে কবির জীবনে এসেছে নানান বর্ণের মানুষ। যাযাবর মানুষেরাও কবির লেখনী থেকে বাদ পড়েনি। ২০নং চিঠিতে কবি লিখছেন— "বেদে জাতটাই এইরকম। কোথাও বাড়ি ঘর নেই, কোনো জমিদারকে খাজনা দেয় না। একদল শুয়োর, গোটা দুয়েক কুকুর এবং কতকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। পুলিশ সর্বদা এদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আমাদের এখানে যারা আছে আমি জানলায় দাঁড়িয়ে প্রায় তাদের কাজকর্ম দেখি। এদের দেখতে মন্দ নয়, কালো বটে, কিন্তু বেশ শ্রী

আছে। মেয়েদেরও বেশ দেখতে। ...পুরুষটা রান্না চড়িয়ে দিয়ে বসে বসে বাঁশ চিরে চিরে ধামা চাঙারি কুলো প্রভৃতি তৈরী করছে... এরা নিতান্তই মাটির সন্তান, নিতান্তই পৃথিবীর গায়ের সঙ্গে লেগে আছে ...যেখানে সেখানে জন্মাচ্ছে, পথে পথেই বেড়ে উঠছে, এবং যেখানে সেখানে মরছে। এদের ঠিক অবস্থাটা ঠিক মনের ভাবনাটা ভারি জানতে ইচ্ছে করে - দিন-রাত খোলা আকাশে, খোলা বাতাসে, অনাবৃত মৃত্তিকার উপরে এ একরকম নতুন রকমের জীবন, অথচ এরই মধ্যে কাজকর্ম ভালোবাসা ছেলেপুলে ঘরকান্না সমস্তই আছে।"[৭]

২২নং চিঠি— "বাতাস ঈষৎ গরম হয়ে যাচ্ছে। ছোট নদীতে বড়ো বেশি নৌকো নেই, ছোট ডিঙি, শুকনো গাছের ডাল এবং কাঠকুটোজে বোঝা নিয়ে শ্রান্তভাবে ছপ্ ছপ্ দাঁড় ফেলে চলছে-- ডাঙার বাঁশের উপর জেলেদের জাল শুকোচ্ছে। পৃথিবীর সকালবেলাকার কাজকর্ম খানিকক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে আসছে।"[৮]

চিঠিতে জেলেদের একটি চিত্র ভেসে ওঠে। "জলের মাঝে মাঝে যে লম্বা ঘাস এবং জলজ উদ্ভিদ জন্মেছে, জেলেরা জাল ফেলতে না এলে সেগুলো সমস্ত দিনের মধ্যে একটু নাড়া পায় না। পাঁচটা ছটা বড়ো বড়ো নৌকা সারি সারি বাঁধা আছে, তার মধ্যে একটার ছাতের উপর একজন মাঝি আপাদমস্তক কাপড় মুড়ে রোদ্দুরে নিদ্রা যাচ্ছে।"[৯]

চাষীদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা কর্মসূচি তাঁর গল্পে কবিতায় যেমন রূপ পেয়েছে, তেমনি চিঠিতেও তার দেখা মেলে। এমনই একটি চিঠি ১৮৯১ সালে লিখেছেন— "খুব একটা নিঃঝুম নিস্তব্ধ নিরালা ভাব। বাতাস অবাধে হু হু করে বয়ে আসছে, নারকেল গাছের পাতা ঝরঝর শব্দ করে কাঁপছে। দু-চারজন চাষা মাঠের এক জায়গায় জটলা করে - ধানের ছোট ছোট চারা উপড়ে নিয়ে আঁটি করে করে বাঁধছে।"[১০]

আবার ৮৮নং চিঠিতে শিলাইদহ থেকে লিখছেন— "চাষারা নৌকা বোঝাই করে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে আসছে - আমার বোটের পাশ দিয়ে তাদের নৌকা যাচ্ছে, আর ক্রমাগত হাহাকার শুনতে পাচ্ছি, যখন আর কয়দিন থাকলে ধান পাকতো, তখন কাঁচা ধান কেটে আনা চাষার পক্ষে যে কী নিদারুণ তা বেশ বুঝতেই পারা যায়।"[১১]

সাজাদপুর থেকে আর একটি চিঠি লিখছেন— "প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ঈঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা ...অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখ দুঃখ কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর। এই সমস্ত ছেলেপিলে, গরু লাঙল, ঘরকন্নাওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভূষোরা আমাকে কি ভুলই জানে। আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।"[১২]

বঞ্চিত অবহেলিত পীড়িত মানুষের প্রতি কবির ভালোবাসা ছিল অপরিসীম। এই ভালোবাসাকে দেখা যেত না, কিন্তু অনুভব করা যেত। কবির সেই অনুভূতিকে আমরা ছুঁতে পারি তাঁর ১৪৬নং চিঠির মধ্যে— "কাজের খাতিরে নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে অবজ্ঞা করে যথোচিত সংক্ষিপ্ত করে চলতে হয়। মনে আছে সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি রাগ করেছিলুম, সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে। এই বলে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁছ করতে গেল। কঠিন কর্মক্ষেত্রে মর্মান্তিক শোকেরও অবসর নেই। কাজের সংসারের দিকে চেয়ে দেখি, কেউ চাকরি করছে, কেউ ব্যবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে, অথচ এই প্রকাণ্ড কর্মক্ষেত্রের ঠিক নীচে দিয়েই প্রত্যহ কত মৃত্যু, কত দুঃখ গোপনে অন্তঃশীলা বহে যাচ্ছে, তার আবরু নষ্ট হতে পারছে না।"[১৩]

নাসিক থেকে প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লিখছেন (১৮৮৬ সালের ১৩ই জুলাই)- "নাসিকে এই মাঠের মধ্যে আমি আছি ভাল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে, মাঝে মাঝে রৌদ্র হচ্ছে— আমি আমাদের একটা দীর্ঘ ঢাকা

বারান্দায় বাসা বেঁধেছি- সেখান থেকে মাঠের পরপারবর্তী দূরের নীল পাহাড়গুলো এবং তার উপরকার শাদা মেঘগুলো স্পষ্ট দেখা যায় - আমাদের এই বাড়ির পাশের ক্ষেত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ দুপুরবেলা চাষীরা চাষ করতে করতে এদেশের একপ্রকার অদ্ভুত মেঠোসুরে গান করছে।"[১৪]

কবি বিলাত থেকে সবে ফিরছেন। কিন্তু জমিদারী দেখাশুনার ভার তাঁকে গ্রহণ করতে হবে। তাই ২ মাসের মধ্যে তাঁকে সেই ভার গ্রহণ করতে হল। এর আগে মাঝে মাঝে জমিদারী দেখাশুনার জন্য তাকে নানা স্থানে যেতে হয়েছে, কিন্তু কর্মভার গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়নি। তাঁর বড় জামাইবাবু সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর পর সেই দায়িত্ব গিয়ে পড়েছিল বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ও ভাইপো দ্বিপেন্দ্রনাথের উপর। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় অন্যান্য দাদা বা ভাইয়ের নানা অসুবিধে থাকার জন্য জমিদারির কাজ দ্বিজেন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের উপরেই বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশেই রবীন্দ্রনাথ ২২ বৎসর বয়স থেকে জমিদারির কাজ দেখাশুনা করেন— "জমিদারির কাজকর্ম শিখিতে হইয়াছিল; সামান্য কেরানী হইতে উচ্চতম নায়েবদের কাজ - সমস্তই তাঁহাকে শিখিতে হয়। বুদ্ধিমান যুবক কবি হইলেও জানিতেন যে, প্রজার অন্নে তাঁহারা লালিত-পালিত হইতেছেন, সুতরাং সেখানে অনবধানতা আসিলে জীবিকায় টান পড়িবে; তাই অতি নিষ্ঠার সহিত সমস্ত কাজ শিক্ষা করিয়া লন। পূর্ববঙ্গের কোনো জমিদারের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, জমিদারি বিদ্যায় ও বিষয়বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য জমিদার সে যুগে ছিল না।"[১৫]

তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি বা বিশ্বাসও করি যে রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রভাবনাতে প্রকৃতির সান্নিধ্য যে গভীর ছিল, তেমনি গভীর ছিল হাসি কান্না ভরা, সুখ-দুঃখ লীলায়িত জীবনের চিত্র, আর এ সুযোগ কবি রবীন্দ্রনাথ পেয়ে গেলেন জমিদারি দেখাশুনার জন্য শিলাইদহ সাজাদপুর পাতিসর, কালিগ্রাম যাত্রাপথে জীবনতরীকে ভাসিয়ে দিলেন পদ্মার বুকে। অন্তরের যোগ ঘটল এই সন্ধিক্ষণে। সকল মানুষকে তিনি দেখলেন দিব্যদৃষ্টিতে। তাঁর কাব্য ও সাহিত্য রচনাতে হৃদয়ের আবেগ অনেকটাই শিথিল হয়ে এল, পদ্মা তাঁর নয়নে থরে থরে সাজানো অসংখ্য নারী পুরুষের সম্পর্ক, শৈশবের খেলার সঙ্গী, প্রেম-বিরহ, না পাওয়া ভালবাসা, বিবাহিত জীবনে ফেলে আসা প্রেম 'একরাত্রি'র মত গল্পে অনবদ্য সুর পাঠকের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করতে হয়েছিল, তাইতো পরিণত জীবনে তিনি লিখছেন—

"আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।"[১৬]

এই কথা প্রতিষ্ঠা করতে তাঁকে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছিল। অনেক শ্লেষও সহ্য করতে হয়েছিল, তাই তাঁর চিঠিপত্রগুলি নিবিড়ভাবে পাঠ করলে মনে হয় জমিদার রবীন্দ্রনাথ নয় মানুষ রবীন্দ্রনাথ মনে মনে কতখানি একা ছিলেন। মানুষের কথা ভেবে তিনি কতটা অসহায় ছিলেন। একটি চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় - ইন্দিরা দেবীকে চিঠিপত্রের ১৮নং পত্রে লিখছেন— "অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র, সুখ দুঃখ কাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোট ছোট বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই সমস্ত ছেলেপিলে - গরু লাঙল - ঘরকান্নাওয়ালা সরল হৃদয় চাষীভূষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।"[১৭]

বৈবাহিক কারণে অনেক আত্মীয়স্বজনকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল এই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। যারা গ্রাম থেকে আসত তাদের অবস্থান ছিল ভিতরের বাড়ির একতলাতে, সেখানে ছোট ছোট ঘরগুলিতে আলোবাতাস প্রবেশ করতে পারত না। তাদের জীবনযাত্রার মানও ছিল খারাপ। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৪০-এ নারীশিক্ষা সমিতির এক ভাষণ-

এ বলেন— "ছেলেবেলা থেকে আমাদের বাড়ীতে দেখেছি, কত নিঃসহায় অনাথা আশ্রয় পেয়েছে। প্রকাণ্ড বাড়িটি তাদের বসবাসে একেবারে পায়রার খোপের মতো হয়ে উঠেছিল। কিন্তু অধিবাসিনীদের অবস্থা তখন অতি শোচনীয় ছিল। তাদের অশিক্ষিত মন আত্মবমাননাতে পূর্ণ হয়ে থাকত। তারা কখনও আত্মমর্যাদা অনুভব করতে পারেনি। তখনকার দিনে দেশের অন্যান্য মেয়েদের মতো অভ্যস্ত অজ্ঞানতা ও অন্ধকারের মধ্যে তারা জন্মগ্রহণ করেছিল। তারা পরস্পরে ঈর্ষা করেছে, নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির দ্বারা যতরকম কুচিন্তার প্রশ্রয় দিয়েছে। মানুষের জগতে তাদের স্থান কত তলায়, তা বোধ করবার শক্তি তাদের ছিল না। এর ফলে হয়েছিল বাড়ীময় অশান্তি, পরস্পরের লাগালাগি ও কলহ বিবাদ। এতে করে বাড়ীর আবহাওয়া একেবারে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। এটুকু বোধও তাদের হয়নি যে, যে বাড়িতে তারা আশ্রিত, পালিত, নিজের ক্ষুদ্র আচরণে তারা সেই বাড়ীরই শান্তি ভঙ্গ করছে। মাকে অনেকসময় এসে তাদের দ্বন্দ্ব মেটাতে হত। এতটাই ছিল সকলের চেয়ে আফশোষের বিষয়। জ্ঞানের যে অসীম তারা বিধাতার কাছে পেয়েছিল, পদে পদে তাদের মধ্যে তার অভাব দেখা যেত। অর্থের অভাব সকলের হয়, কিন্তু মানুষের যেটা স্বাভাবিক পাওনা, তার শুভবুদ্ধি, তারই যখন অভাব হয়, তখন গৃহে ঘোরতর বিপত্তি ঘটে।

এই বিপত্তি জোড়াসাঁকো বাড়ির সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশে প্রায়ই দেখা দিত, মাঝে মাঝে আলোকিত অংশকেও তারা আক্রমণ করত। এই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্রকন্যাকে এই বাড়ির পরিবেশ থেকে দূরে রাখা পছন্দ করতেন, রবীন্দ্রনাথও প্রায়শই তাঁর পরিবারকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন— পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও কন্যা মীরা দেবীকে লেখা অনেক চিঠিতে এই পরিবেশ সম্পর্কে সতর্কবাণী দেখা যায়। আমাদের ধারণা 'চার অধ্যায়' (১৩৪১ : 1934) উপন্যাসের একটি বর্জিত অংশে এই অভিজ্ঞতাই ভাষারূপ লাভ করেছি"।[১৮]

তেইশ বৎসরের যুবক রবীন্দ্রনাথের কাছে (আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক হিসেবে যখন কর্মভার গ্রহণ করেন) একদিন যে ধর্ম পৃথিবীর ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম) বলে মনে হয়েছিল— "প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব? এই জন্যই বলি ব্রাহ্মধর্ম পৃথিবীর ধর্ম বটে, পৃথিবীকে আমরা এই ধর্ম হইতে বঞ্চিত করিতে পারিও না, চাহিও না, ...ব্রাহ্মধর্মের জন্য পৃথিবী ভারতবর্ষেরই নিকটে ঋণী।"[১৯]

নানান পদ্ধতিতে শিক্ষার মানের সাথে সাথে যে স্বনির্ভরতা গড়ে ওঠে, সে কথা তাঁর মত জীবনে ও কর্মে কেউ বোধহয় ভাবেননি। অর্থাৎ পরের হিতের জন্য নিজের জীবনের এই পরিশ্রম ত্রিশ উত্তর জীবনে আরও গভীর ও ধারাবাহিকভাবে লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ রবীন্দ্রমনে ধীরে ধীরে জন্ম নিচ্ছে সাধারণ (প্রান্তিক) মানুষের অবস্থান। এই প্রান্তিক মানুষেরাই তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যসাধনাতে ফুটে উঠেছে সর্বহারা মানুষরূপে।

তথ্যসূত্র :

১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী - প্রথম খণ্ড (১২৫৮-১৩০৮ ।। ১৮৬১-১৯০১)- বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র-১৪১৭, পৃঃ ১৯

২। প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, (১২৬৮-১২৮৪) - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ - বৈশাখ ১৪১৮, পৃঃ ৬১

৩। তদেব, পৃঃ ৯৩

৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা-১, প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৯৬, আগষ্ট ১৯৮৯, পৃঃ ৩০৩
৫। তদেব, পৃঃ ৩০৪
৬। তদেব, পৃঃ ৩০৮
৭। তদেব, পৃঃ ৩০৯
৮। তদেব, পৃঃ ৩১১
৯। তদেব, পৃঃ ৩০৬
১০। তদেব, পৃঃ ৩২০
১১। তদেব, পৃঃ ৩৫১
১২। তদেব, পৃঃ ৩৯৬
১৩। তদেব, পৃঃ ৩৮৬
১৪। প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, (১২৬৮-১২৮৪) - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ - বৈশাখ ১৪১৮, পৃঃ ২৩৪
১৫। তদেব, পৃঃ ৩০৪
১৬। রবীন্দ্র রচনাবলী (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত, সুলভ সংস্করণ), একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ - মাঘ, ১৪২১, পৃঃ ১৪৯
১৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মহাকরণ, কলকাতা-১, প্রথম প্রকাশ - শ্রাবণ ১৩৯৬, আগষ্ট ১৯৮৯, পৃঃ ৩৯৬
১৮। প্রশান্ত কুমার পাল, রবিজীবনী, প্রথম খণ্ড, (১২৬৮-১২৮৪) - আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, পুনর্মুদ্রণ - বৈশাখ ১৪১৮, পৃঃ ৩৩
১৯। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী - প্রথম খণ্ড (১২৫৮-১৩০৮ ।। ১৮৬১-১৯০১)- বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র-১৪১৭, পৃঃ ২০৭